তত্ত্ববিদ্যা ।

142. Jd 867.1(2)

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় খণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৯ শক।

১০ মাঘ।

PRINTED BY KALLYDASS CHUCKERBUTTY.

তত্ত্ববিদ্যা।

কর্ম্মকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ব বিদ্যার আলোচনা কেবল এই জন্য উপকারী যে তাহাতে আমাদের তর্ক শক্তি বিশেষ-রূপে মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হয়; কিন্তু, তাহাতে যে আমাদের জীবনের প্রতি কোন ফল দর্শে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা তর্ক শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন—তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে;

কিন্তু তত্ত্ব বিদ্যা তাঁহাদের সে পক্ষে কিছুই সাহায্য দিতে পারিবে না, বরং নানা রূপ বাধা আনিয়া ফেলিবে। তত্ত্ব-বিদ্যার প্রণালী এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ আমরা যাহা জানি, তাহার প্রতি যেন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, এবং আমাদের যাহা বিশ্বাস তদনুযায়ী যেন কার্য্য করি। পরন্তু তর্ক শিক্ষার প্রণালী এই যে, মুল-তত্ত্ব বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাতে যেন সংশয় করি,—সংশয় অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের কার্য্য—যেমন একটা নৌকার হালি না থাকিলে হয়, সেই রূপ—অতীব অনিয়মে চলিতে থাকে। অতএব তত্ত্ব-বিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র দুইকে এক দৃষ্টিতে দেখা অতীব ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই। উদাহরণ ;—তত্ত্ব বিদ্যা বলেন, "আমি আছি" ইহা আমরা তর্ক ব্যতিরেকে ঈশ্বর

প্রসাদাৎ জানিতেছি, এবং ইহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর এবং আমরা সেই বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করি,—অর্থাৎ জড়-পদার্থের নিয়মানুসারে নহে কিন্তু আ-ত্মার নিয়মানুসারে কার্য্য করি—পশুবৎ নহে কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য করি। তর্ক-বুদ্ধি বলেন, "আমি আছি" এই এক তথ্য যাহা আমরা জানিতেছি, এবং ইহার প্রতি আমরা সংশয় করি, কার্য্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, কার্য্য—দেহাদির অবস্থানুসারে আপনা আপনি চলিতে থাকিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, তর্ক বিতর্কেরই কার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ নাই, প্রত্যুত তত্ত্ব-বিদ্যার—কার্য্যের সহিত অব্য-বহিত যোগ রহিয়াছে। পুনশ্চ তত্ত্ব-বি-দ্যার সিদ্ধান্ত-সকলের সত্যতার এ একটি সামান্য পরিচয় নহে যে, সে-সকলেতে আমরা অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে

পারি ও সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু শুদ্ধ কেবল তর্ক বিতর্কের সিদ্ধান্ত-সকলেতে আমরা কখনই অন্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি না, এবং তদনুসারে স্থির-ভাবে কার্য্য করিতেও সমর্থ হই না। ইহার উদাহরণ;—আত্মা, এক ভাবাত্মক স্বাধীন,—এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, ইহাতে আমরা অক্ষুব্ধ-চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারি, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আত্মা—এক নহে, ভাবাত্মক নহে, স্বাধীন নহে, এরূপ সহস্র তর্ক উত্থাপিত হইলেও তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণের বিশ্বাস কখনই সায় দিবে না, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলেই তাহার অকিঞ্চিৎকরতা তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

একক্ষণে বক্তব্য এই যে জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের মূলতত্ত্ব সকল অবধারিত হইয়াছে, ভোগকাণ্ডে ভাবের মূল-আদর্শ সকল নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মূল নিয়ম কি কি তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিয়মান্বেষণের প্রণালী।

নিয়ম-সকল অনুধাবন করিবার প্রণালী দুই রূপ, এবং তদনুসারে দুইটি নাম দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে, যথা,—একের নাম আরোহিকা, অন্যের নাম অবরোহিকা। বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সকল অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সাধারণ নিয়মে আরোহণ করিবার যে প্রণালী—আরোহিকা

নাম তাহারই প্রতি বর্ত্তিতে পারে ; এবং সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়মিত ঘটনা সকলে অবতরণ করিবার যে প্রণালী, তাহাই অবরোহিকা নামের অভিধেয়। ইহার মধ্যে আরোহিকা প্রণালী ভৌতিক নিয়ম-সকল অনুসন্ধান কালেই বিশিষ্ট-রূপে উপকারে আইসে, এবং অবরোহিকা প্রণালী আধ্যাত্মিক নিয়ম সকলেতেই বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন হয়। আমরা দেখি যে ইষ্টক প্রস্তর ও আর আর সামগ্রী স্ব স্ব অবলম্বন হইতে পরিচ্যুত হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত হয়. ইহা হইতে আমরা এই এক নিয়ম আহরণ করিয়া লই যে পৃথিবীর উপরে যত কিছু সামগ্রী আছে—সকলকেই পৃথিবী আপনার দিকে আকর্ষণ করে। এস্থলে ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুরই অধঃপতন দৃষ্টি করা হইল, কিন্তু নিয়ম যে-টি নির্দ্ধারিত হইল তাহা

নির্ব্বিশেষে ভারবৎ বস্তুরই অধঃপতনের উপযোগী। এই রূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা হইতে সাধারণ নিয়মসকলে উত্থান করিবার যে প্রণালী—যাহার নাম আরোহিকা রাখা গেল—তাহা ভৌতিক কার্য্য সম্বন্ধেই বিশেষ-রূপে ফলদায়ক হয়। অপর, নিয়মিত বিষয়সকল হইতে নিয়মে আরোহণ না করিয়া, আমরা যখন নিয়ন্তা বিষয়ী হইতে নিয়মে অবরোহণ করি, তখনকার এই যে অবরোহিকা প্রণালী, ইহা আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুসন্ধানের পক্ষেই বিশেষ রূপে ফলদায়ক হয়। আধ্যাত্মিক নিয়ম দুই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মিশ্র এবং বিশুদ্ধ; যথা,—যদি এ রূপ একটি নিয়ম করা যায় যে আমি অমুক সময়ে আহার করিব তবে তাহাতে বুঝায় যে, প্রথমতঃ আমি আরোহিকা প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি অবগত হইয়াছি যে ঐ সময়ে আহার করিলে

শরীর ভাল থাকে, দ্বিতীয়তঃ অবরোহিকা প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি ধার্য্য করিয়াছি যে যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য; এই দুই নিয়মের সংমিশ্র হইতেই পূর্ব্বোক্ত এই নিয়মটি প্রসূত হইয়াছে যে "আমি অমুক সময়ে আহার করিব," এই জন্য এ নিয়মটির প্রতি মিশ্র উপাধি সম্যক্ রূপে সংলগ্ন হয়। পরন্তু, আমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, এ নিয়মটি কোন ভৌতিক ব্যাপার হইতে নহে কিন্তু কেবল মাত্র আত্মা হইতেই প্রকটী-কৃত হইয়া থাকে; অমুক সময়ে আহার করিব, এ নিয়ম কিছু সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতে সংলগ্ন হয় না; কিন্তু "আমার যাহাতে মঙ্গল হয়—তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য" এ নিয়মটি সকল আত্মা হইতে সকল অবস্থাতেই নিরন্তর উদীরিত হইতেছে; পূর্ব্বের ও-নিয়মটির

কিয়দংশ ভৌতিক পরীক্ষা হইতে সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়মটিকে আত্মা স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কার্য্য-সকলেতে বর্ত্তমান করিতেছে। আরোহিকা এবং অবরোহিকা প্রণালীর আর এক যোগ্যতর নাম রাখা যাইতে পারে, যথা,—সংকলন প্রণালী এবং ব্যবকলন প্রণালী; অনেক বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনা হইতে এক এক সাধারণ নিয়ম সংকলন করিবার যে প্রণালী—সংকলন প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে বোধ গম্য হইতে পারে; এবং নিয়ন্তা হইতে নিয়ম দোহন করিবার যে প্রণালী ব্যবকলন প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে অভিজ্ঞাত হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

মঙ্গলের কর্ত্তব্যতা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইল, তদ্দারা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, ব্যবকলন প্রণালী অনুসারেই মূল নিয়ম-সকলের সন্ধান করিতে হইবে; বাহিরের ঘটনা-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

আত্মা যে নিয়মটি প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, তাহা এই,—যে, যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ নিয়মটি সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবাদের এই এক সূত্র সংগোপিত রহিয়াছে যে, মঙ্গল যে কি—এ বিষয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবার কিছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে যদি জিজ্ঞাসা করা

যায় যে—সত্য কি? তাহা হইলে আপাততঃ তাহার প্রত্যুত্তর এই যে মৃত্তিকা উদ্ভিদ্ জীব জন্তু, এ সকলই সত্য; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে পরম সত্য কি? তবে তাহার প্রত্যুত্তর এই যে পরমাত্মাই কেবল এক মাত্র পরম সত্য। এই রূপই বলা যাইতে পারে যে, নিয়মিত আহার নিদ্রা আচার ব্যবহার—এ সকলই মঙ্গল, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে—যাহার গুণে আমরা তাঁহার প্রেমময় সন্নিধানে দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছি—তাহাই প্রধানতম মঙ্গল ও পরম মঙ্গল, এবং এই মঙ্গলের সহিত যাহার যে পরিমাণে যোগ তাহা সেই পরিমাণেই মঙ্গল। আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়—সকল আত্মাই এই রূপ নিয়মে কার্য্য করে; অতএব একমাত্র যাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া সকল আত্মা ঐ রূপ মঙ্গল নিয়মে কার্য্য করিতেছে তিনি অবশ্য

সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ। মঙ্গল নিয়ম—পরমাত্মা হইতে আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং তাহারই গুণে আমরা আবার স্বীয় স্বীয় বিষয়-কার্য্য-সকল মঙ্গল নিয়মে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদের আত্মাকে বিষয়-পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত করত তাহাকে একবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা উচিত যে, সে আপন স্বভাবানুসারে—কি রূপ নিয়মে কার্য্য করে; ধৃত পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে নিষ্কৃতি পাইলে প্রথমে সে অগম অরণ্য-নিকেতনের মধ্যে গিয়া নিমগ্ন হয়, পরে তাহার যথার্থ গীতধ্বনি সেখান হইতে নিজ স্ফূর্ত্তিতে নিঃসারিত হইতে থাকে,—সেই রূপ আত্মা স্বাধীনতা পাইলে প্রথমে সে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মাতে গভীর নিমগ্ন হয়, তদনন্তর কিছু কাল পরে তাহা হইতে প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য-সকল সংসার-ক্ষেত্রে অনর্গল নিঃসারিত হইতে থাকে।

অতএব মঙ্গল কি—জানিতে হইলে, প্রথমে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ জীবাত্মা স্বীয় বিষয়-কার্য্যেতে সেই মঙ্গলের ভাব কিরূপে প্রয়োগ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা বিধেয়; অবশেষে অজ্ঞান প্রকৃতি মঙ্গলের পক্ষে কিরূপ উপযোগী তাহা নিরূপণ করিবার সদুপায় হইতে পারিবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারমার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; জীবাত্মার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ-স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে স্বার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; এবং অজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে প্রাকৃতিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পারমার্থিক মঙ্গল

এবং

তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

আমাদের মধ্যে যাহার যে কিছু মঙ্গল ভাব রহিয়াছে তাবতেরই মূল পরমাত্মা, ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি; এবং জ্ঞানের এ বাক্যটিতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাও স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইতেছে; এই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা আপনা আপনাকে ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছাতে অসংকোচে সমর্পণ করি,—এই রূপ মনে করিয়া যে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই অনুসারে তিনি আমাদিগকে নিয়মিত করুন। এই রূপ, জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত

ইচ্ছার সহিত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক মঙ্গল নিয়মে নিয়মিত হওয়া—জ্ঞানবান্ আত্মা মাত্রেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের এরূপ যোগ রহিয়াছে যে, আমরা যত স্বাধীন হইব তত তাঁহাকে চাহিব; কেননা, আমরা যদি স্বাধীন হইলাম, তবে যিনি সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গল চাহেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকে চাহিব? পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ-রূপে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা—ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার মূল; যথা, "আমার মঙ্গল হউক" এ ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (কেননা আত্মা স্ববশ হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না). সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই আমাদের প্রত্যেকের এই স্বাধীন ইচ্ছাটিকে নিয়ত উদ্দীপন করিতেছেন, তাই আমাদের এ ইচ্ছা রাশি রাশি বিপদের তরঙ্গ মধ্যেও নির্ব্বাপিত হয় না;—সহস্র

দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িলেও কোন মনুষ্যই ভিতরে ভিতরে মঙ্গল চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় না।

প্রতি আত্মাতেই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত মঙ্গল ভাব নিগূঢ় আছে, ইহা সত্য কি মিথ্যা জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিয়াছে কি না বলিয়াছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া—একেবারেই আমাদের স্ব স্ব আত্মাতে দৃষ্টি করা বিধেয়। কেননা আত্মা হইতে ব্যবকলন করিয়া আমরা যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্বেগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি; পরন্তু এখান-ওখান হইতে সংকলন করিয়া আমরা যে সকল মতামত ধার্য্য করি, তাহা যেমন সত্য হইতে পারে তেমনি অসত্যও হইতে পারে, সুতরাং তাহা কখনই সম্যক্‌রূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে না। মঙ্গল-ভাব যদিও আমাদের আপন আপন আত্মাতেই রহিয়াছে,

তথাপি যে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—ইহার অবশ্য কারণ আছে, যথা;—

আমাদের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দুই রূপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এক রূপ মঙ্গল ভাব এই যে, তাহার পদে পদে বাধা বিঘ্ন, ও চতুর্দ্দিকে প্রতিবন্ধক,—কোথাও প্রলোভন কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বিভীষিকা মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কোথাও জটিল হৃদয়-গ্রন্থি পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। এই প্রকার মঙ্গল ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই সচরাচর বলা গিয়া থাকে যে, শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি; রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন দ্বারা ইহা এমনি প্রপীড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে দেখিতে পাওয়াও একটি সহজ ব্যাপার নহে,—মোহ শোক ভয়ের পর্ব্বত-রাশি ভেদ করিয়া তবে ইহাকে দেখিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল ভাব এই যে, তাহাতে

কিছু মাত্র বাধা নাই বিঘ্ন নাই তাহা অতীব পরিশুদ্ধ। আমাদের এই পৃথিবীটির আদিম অবস্থায় আমরা যদি ইহার উপরে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে ইহার মুখশ্রী এখনকার মত এরূপ হইবার পক্ষে কি না ভয়ানক প্রতিবন্ধক-সমূহ আমাদের নেত্র-গোচর হইত? কিন্তু সে-কালের সেই সকল ভূত-সঙ্গ্রাম কি মঙ্গলের কর্ণকে বধির করিতে পারিয়াছিল?—না মহাভূত সকলের প্রবল প্রকোপ মঙ্গলের হস্তকে রোধ করিতে পারিয়াছিল? এই প্রকার এই যে প্রভুত্ব মঙ্গল ভাব, ইহা নিঃশব্দে ও নিরুদ্বেগে সমুদায় জগতের উপরে নিয়ত কার্য্য করিতেছে,—কোন বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ও স্বকার্য্য-সাধনে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সকল নিয়মেরই উপরে এই মঙ্গলের নিয়ম রহিয়াছে, কিন্তু ইহার উপরে আর কাহারো নিয়ম নাই। এক্ষণে বলা

বাহুল্য যে, প্রথম প্রকার পরিমিত মঙ্গল ভাব—জীবাত্মার, ও দ্বিতীয় প্রকার সর্ব্ব-মঙ্গল ভাব—পরমাত্মার ; এবং এই দুয়ের মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ যে, জীবাত্মার মঙ্গল ভাব যে পর্য্যন্ত না পরমাত্মার মঙ্গল ভাবের সহিত আপনার যোগ সংস্থাপন করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহা সংসার-ভারে প্রপীড়িত হইয়া মৃতবৎ হইয়া থাকে, এই জন্য এ অবস্থায় উহা আছে কি নাই তাহা লক্ষ্য হওয়া ভার।

দর্শন-শাস্ত্র বিশেষের আলোচনা দ্বারা আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইব ততই আমাদের স্বাধীনতার নির্ব্বাণ হইবে ; কিন্তু সত্য এই যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইব ততই আমরা স্বাধীন হইব। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে গিয়া স্বাধীন হয়, বালক যেমন ক্রীড়া-

ক্ষেত্রে গিয়া স্বাধীন হয়, যুবা যেরূপ বয়স্য দলের মধ্যে গিয়া স্বাধীন হয়, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মার সন্নিধানে গিয়া স্বাধীন হয়। স্বাধীন ইচ্ছা যে কি-রূপ—এক্ষণে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

আত্মার অভ্যন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অবয়ব অন্বেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রথমতঃ আত্মামাত্রেই অগ্রে নিয়ম স্থির করে পশ্চাৎ সেই নিয়ম পালন করে—এই রূপে কার্য্য করে। যথা, আমি যদি অগ্রে এই রূপ নিয়ম করি যে "আমি চলিব" এবং পশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন করি অর্থাৎ তদনুসারে চলি, তবেই সেই কার্য্যকে বলা যাইতে পারে—আত্মার কার্য্য কি না আমার আপনার কার্য্য; কিন্তু যদি আমি সুষুপ্ত অবস্থায় শয্যা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করি, তাহা হইলে সে কার্য্য আমার আপন নিয়মানুসারে না হওয়াতে

তাহা কখনই আমার আত্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে, জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্যের ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-নিয়ম। স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন—আ-ত্মার অধীন; যে ইচ্ছা আত্মার অধীন তাহা কাজেই আত্মার নিজের গুণ-সকলের সহিত ঐক্য হইতে চায়; ইচ্ছা ব্যতিরেকে আত্মার আর দুইটি গুণ—জ্ঞান এবং প্রীতি; অত-এব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই যে তাহা জ্ঞান ও প্রীতি শ্রদ্ধাদি ভাবের সহিত স্বভাবতঃই ঐক্য হয়। এই জন্য কোন প্রাচীন ঋষি তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থানে এই রূপ কহিয়াছেন যে, "শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং" শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না;—শ্রদ্ধার সহিত দান করাই যে স্বাধীন ইচ্ছার

কার্য্য এবং অশ্রদ্ধার সহিত দান করা যে সে রূপ নহে, ইহা সকল মনুষ্যেরই মনে স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়। অতএব সত্য-জ্ঞান মূলক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অনুযায়ী আচরণকেই স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে যে ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যখন আমাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন তাঁহাতে আত্মা সমর্পণ করাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং তাহার বিপরীতাচরণ করাই পরাধীনতার লক্ষণ।

আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়—পারমার্থিক সত্য, সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই বলা যায়—পারমার্থিক মঙ্গল। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান যেমনি দেখাইয়া দেয় যে, সকলের মূলে এক জন মহান্ পুরুষ বর্ত্তমান আ-

ছেন—যিনি পরম সত্য; সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা চাহে যে, সকলের উপরে এক জন বিধাতা পুরুষের বর্ত্তমান থাকা উচিত—যিনি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল স্বরূপ,—সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন"। ঈশ্বরের সহিত যোগেই আমরা স্বাধীন হই; এই হেতু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত হয়, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-মূলক আমাদের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা, ইহা-দ্বারা যে সকল নিয়ম প্রকটিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের নিয়ম। অন্তরতম পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় সহবাসে আত্মা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন বিষয়ের আকর্ষণ তাহার উপরে বল করিতে পারে না; এই হেতু এ অবস্থায় আত্মা বিষয় হইতে নিয়ম ভিক্ষা করে না, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত আপন অকৃত্রিম স্বভাব হইতে নিয়ম

উদ্ভাবন করে,—পরমাত্মা হইতেই নিয়ম চাহিয়া পায়। ধর্ম্মের নিয়ম কি? ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—ধর্ম্মের নিয়ম এইরূপ বহু সংখ্যক; কিন্তু আর এক দিকে দেখিলে, উক্ত তাবতের সার এই একটি মূল নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে; পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পবিত্র হইবে। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার সার্ব্ব-লৌকিক মঙ্গল ভাব যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা যে এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে আছে ও জীবে নাই, এ মনুষ্যে আছে ও মনুষ্যে নাই, এমন কদাপি নহে;—তাহা সর্ব্বত্রগামী,—তাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ। ঈশ্বরের হস্ত হইতে এই রূপ সার্ব্ব-লৌকিক মঙ্গল-রস পান করিয়াই সাধু মহাত্মারা

স্বাধীন হন,—স্বাধীন হইয়া কি করেন? না—কেবল আপনার আপনার মঙ্গল নহে, কিন্তু মঙ্গল—যাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ, তাহারই অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হন; ঈশ্বরের মঙ্গল-সন্নিধানের গুণে নির্ভয় হইয়া, তাঁহারা মঙ্গল সাধন কার্য্যে সর্ব্বদাই এরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন যে, যখনই কোন মঙ্গল কার্য্য তাঁহাদের সামর্থ্যের মধ্যে আইসে, তখনই তাঁহারা সুবিবেচনা ও সুনিয়ম পূর্ব্বক তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, ঈশ্বরের উপাসনা-জনিত যাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটি অবতীর্ণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেনই, তিনি কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কেন না সযত্ন হইবেন। এইরূপে যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের হইয়া কার্য্য করেন—যাঁহারা কেবল আপনার আপনার নহে কিন্তু জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা

আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না, পরকেও সেই রূপ প্রতারণা করেন না, আপনার অধিকারকে যেমন অবহেলা করেন না, পরের অধিকারকেও সেই রূপ অমান্য করেন না, আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, পরকেও সেই রূপ বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন,—তাঁহারা স্বভাবতই এই প্রকার আচরণ করেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে,—মিথ্যা কহিবে না, পরের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, এ সকলই এই এক মুল নিয়ম হইতে ব্যবকলন করিয়া পাওয়া যায় যে, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার সহিত আত্ম-সমর্পণ করিবে। "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'

পঞ্চম অধ্যা

স্বার্থিক মঙ্গল
এবং
তদনুযায়ী মূল নিয়ম।

আমাদের আত্মা আপন ইচ্ছায় পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইলে, সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন আমারদের মনের প্রবৃত্তি সকল আমারদের স্বীয় আত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, তখনই আমাদের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে কারণে ইহা কর্ত্তব্য যে সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলে, সেই কারণেই কর্ত্তব্য যে আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তি আমাদের আত্মার অধীন হইয়া চলে ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলা যে কি কারণে ক-কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যখন জগতের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হই, তখন আমারদের নিজের নিজের মঙ্গল-সাধন কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? কখনই না;—আমরা প্রতি জনেই জগতের অন্তর্গত, এই জন্য জগতের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমারদের আপনারদের মঙ্গলও সাধন করা হয়।

সমুদায় আত্মার মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃত্তি সকলের মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র। আমরা যদি কেবল আমারদের জ্ঞানেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের ভাবের উন্নতি সাধন করা হয় না; যদি কেবল ভাবেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা হয় না; এই রূপ, যে মঙ্গল আমারদের কোন একটি বিশেষ অব-

স্থার উপযোগী, তাহা অন্য এক অবস্থার অনুপযোগী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতএব আমারদের সমুদায় আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমারদের সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে আমাদের মনের বৃত্তি সকল আত্মার অধীনে পরিচালিত হয়।

প্রথম কর্ত্তব্যটি সাধনের নাম পারমার্থিক মঙ্গল সাধন। আমরা আমারদের নিজের চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিষয়েতে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সমুদায় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে হইলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না; পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়, ইহাতেই আমাদের ধর্ম্ম হয়, ইহারই নাম পারমার্থিক মঙ্গল, এ মঙ্গলের বিষয় পূর্ব্বে

অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা উপরে উল্লিখিত হইল, কি না—আমারদের মনের বৃত্তি সকলকে আত্মার অধীনে রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করা, ইহারই নাম স্বার্থিক মঙ্গল সাধন, ইহারই বিষয় এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রবৃত্তি-সকলকে আত্মার বশীভূত করা-কে যদি স্বার্থ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ শব্দের চলিত অর্থের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া উহাকে এক অযোগ্য উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কিন্তু স্বার্থ-সাধন শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি যদি একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ওরূপ ভ্রম কখনই মনে স্থান পাইতে পারিবে না। স্বার্থ-সাধন শব্দের অর্থ এই যে, আমারদের নিজের অভীষ্ট

সিদ্ধ করা; একপ করিতে হইলে আমা-
দের প্রবৃত্তি-সকলকে আপন বশে রাখা
নিতান্তই প্রয়োজনীয়; কেননা যদি আমা-
রদের প্রবৃত্তি-সকল বিনা-নিয়মে যথা তথা
ধাবিত হয়, তাহা হইলে কি রূপে আমরা
আমারদের নিজের কোন অভীষ্ট সাধনে
সমর্থ হইব? মনে কর যে কতক পরিমাণ
অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে আপাততঃ
আমারদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; দেখ, এই
একটি স্বার্থ উপযুক্ত-রূপে সাধন করিতে
হইলে, আপন মনোবৃত্তি-সকলকে কেমন
বশীভুত করিতে হয়,—আলস্যকে পরাজয়
করিতে হয়, বিলাস-লালসাকে দমন করিতে
হয়, তৎপরতা অভ্যাস করিতে হয়; এই
রূপ যখন আমারদের মনোবৃত্তি-সকল ক্রমে
ক্রমে আমারদের আত্মার বশে সংস্থাপিত
হয়, তখনই আমরা যথার্থ রূপে স্বার্থ-সাধ-
নের—কি না স্বকীয় অভীষ্ট সাধনের উপ-

যুক্ত হই। পুনশ্চ যখন আমারদের মনো-নীত অর্থ-লাভে আমরা কৃতকার্য্য হই, তখন তাহাকে আমরা ইহারই জন্য স্বার্থ-সিদ্ধি বলি, যেহেতু তাহাতে আমরা আমারদের মনোবৃত্তি-সকলকে যথাভিরুচি সুনিয়ম অনুসারে চালাইতে নানাপ্রকার পথ পাই। কিন্তু সেই অর্থ-সহকারে যদি আমরা কেবল উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি-সকলের সেবায় রত হই, সুতরাং প্রবৃত্তি সকলকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া পরিচালনা করিতে ভার বোধ করি, তাহা হইলে সে অর্থ দ্বারা আমারদের স্বার্থ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা আমারদের অনর্থই সাধিত হয়। পূর্ব্বে অবধারিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব জগতের সমশুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মার অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত করা-কে পরমার্থ-সাধন কহে,—এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে যে, স্বীয় প্রবৃত্তি-সকলকে আত্মার অধীন করিয়া পরিচালনা করা-কেই স্বার্থ সাধন কহে।

সমুদায় জগতের মঙ্গল—যাহা আমাদের কাহারো নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র মঙ্গল নহে পরন্তু যাহা অসীম মঙ্গল, যাহা অসীম উন্নতির চিরবাঞ্ছিত লাভাতীত অনন্ত ফল, সে মঙ্গলের প্রবর্ত্তক কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর; এই জন্য সে মঙ্গল যদিও আমারদের প্রজ্ঞাতে অনিবার্য্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে আমরা বুদ্ধিতে কোন রূপেই আয়ত্ত করিতে পারি না; কেবল আমারদের নিজের কল্পিত মঙ্গলকেই আমরা আপন বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি; এবং স্বীয় বুদ্ধিতে মঙ্গল কল্পনা করিয়া যে পরিমাণে আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি, সেই পরিমাণে সেই কল্পিত মঙ্গলের মূলীভূত প্রজ্ঞানিহিত বাস্তবিক মঙ্গলেতে আমাদের বিশ্বাস বল পাইতে থাকে। আমাদের আত্মার স্বভাবই এই যে, সে প্রজ্ঞা-দ্বার দিয়া পরমাত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন

করে এবং বুদ্ধি-দ্বার দিয়া বিষয়-কল্পনায় ব্যাপৃত হয়, উভয় কার্য্যই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এক যোগে নির্ব্বাহ করে ; তুলাদণ্ড যেমন—এ দিকে শিরঃসমুন্নত কণ্টক দ্বারা গগন শিখরের প্রতি লক্ষ নিবিষ্ট করে ওদিকে স্কন্ধালম্বিত রজ্জু দ্বারা ধরাকৃষ্ট ভার-দ্বয় বহন করে, উভয় কার্য্যই একত্র নিষ্পন্ন করে,—সেই রূপ

ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গলকে যদিও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, আমরা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যদিও আমরা শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টায় সে মঙ্গল-সাধনের বিন্দুমাত্রও সম্পন্ন করিতে পারি না, তথাপি আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি যে, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছা কর্তৃক যেন আমরা সকলে নিয়মিত হই ; এই রূপ যখন ঈশ্বরের

ইচ্ছার সহিত আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তখন তাহা হইতে প্রসূত অমৃত ফল-স্বরূপ এই একটি সত্য তিনি আমারদের আত্মাতে সমর্পণ করেন যে, তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা নিরন্তরই সাধিত হইতেছে, তাহার জন্য কিছুমাত্র শঙ্কা নাই;—কথায় তিনি আমাদিগকে কিছুই বলেন না, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গল-ভাবের যথা-পরিমাণ আভাস দ্বারা আমারদের আত্মাকে এরূপ পূর্ণ করেন যে, তাহাতে নিমেষের মধ্যে আমাদের আত্মা অনুপম বলবীর্য্য ও শান্তিতে পরিপ্লাবিত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের প্রসাদ যাহা সতত সর্ব্বত্র অপার-করুণাবনত রহিয়াছে, তাহাকে আমারদের নিজ আত্মাতে আদরের সহিত আহ্বান-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে গ্রহণ করা এবং সেথায় তাহাকে অটল রূপে প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ তাহাকে সাধ্যানুসারে পরিবারের

মধ্যে, সমাজের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে, উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বিস্তার করা—আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আদান প্রদানের সামঞ্জস্য-বিধি যাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, পারমার্থিক জগতের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। আমরা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমারদের সমুদায় কামনা পূর্ণ করেন। আত্মপর-নির্ব্বিশেষ পূর্ণ মঙ্গলেতে আমরা যে পরিমাণে আমাদের আত্মা সমর্পণ করি, সে মঙ্গলও সেই পরিমাণে আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে আসিয়া বসতি গ্রহণ করে। এই রূপে,—অসীম আকাশ ব্যাপিয়া, যুগ-যুগান্তর পরিমাপন করিয়া, সমুদায় জগতের মধ্যে যে এক অসীম মঙ্গল-ভাব স্বকার্য্য সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কণা-মাত্র প্রসাদ

যদি আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা কিনা সম্পদ লাভ করি? তাহা হইলে সমুদায় জগৎ যেমন একটি সুন্দর শৃঙ্খলায় গ্রথিত হইয়া ঈশ্বরের অধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই রূপ আমাদের মনের সমুদায় প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের নিজ নিজ আত্মার অধীনে সংস্থাপিত হয়। এই রূপ যখন আমরা ঈশ্বরাভিপ্রেত মঙ্গল ভাব অনুসারে আমাদের প্রবৃত্তি সকলকে যথানিয়মে পরিচালনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের পথ অবলম্বন করি। কেননা, ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি—ইহারা আমাদের স্বার্থ-সাধনের উপায় মাত্র; সাক্ষাৎ স্বার্থ সাধন কি? না স্বকীয় মনের বৃত্তি সকলকে সামঞ্জস্য রূপে চরিতার্থ করা, ইহা হইলেই স্বার্থ সাধনের কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

শুদ্ধ কেবল পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বরের অধীন হইয়া পাপ হইতে বিরত হইয়া, সকল অবস্থাতেই মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এবং তদুত্তর স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বর আমাকে আপাততঃ যেরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন সে অবস্থাতেও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে;—যথা; ঈশ্বর আমাকে এই রূপ মনোবৃত্তি সকল দিয়াছেন—এসকলকে যথোপযুক্ত রূপে চালনা করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ শরীর দিয়াছেন—ইহাকে যথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ পরিবার দিয়াছেন—পরিবারস্থিত সকলের প্রতি সম্বন্ধোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সহকারে যথোপযুক্ত রূপ ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ সমাজে সমর্পিত করিয়াছেন—অতএব মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে

হইবে, সমতুল্য ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইবে, অনুগত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে, এই রূপ সকলের প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন,—অতএব স্বদেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, স্বদেশের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয়, তাহার জন্য যত্ন পাইতে হইবে; তিনি আমাকে এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন,—পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা যতটুকু আমাদের সাধ্যায়ত্ত তাহা করিতে হইবে। পুনশ্চ যদি এ রূপ হয় যে আমি কৃষকের গৃহে জন্মিয়া কৃষি-কার্য্যই শিক্ষা করিয়াছি, তাহা হইলে সেই কার্য্যই উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে; যদি এ রূপ হয় যে আমি ধনবানের গৃহে জন্মিয়া ধনোপার্জ্জন বিষয়ে অথবা কোন বিদ্যা-বিশেষের অনুশীলন বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহা হইলে যাহাতে আমার

অবস্থার উপযুক্ত রূপে সেই ধনের আয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে অথবা সেই বিদ্যা বিশেষের আলোচনা হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে ; ইত্যাদি।

কিন্তু এ রূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, উপস্থিত সকল অবস্থাই আমাদের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে সমান রূপ অনুকূল হইবে ; প্রত্যুত ইহা সকলেরই দৃষ্টিপথে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে যে, কোন অবস্থা আমাদের স্বার্থের অল্প অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার অধিক অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার প্রতিকূল,— আমরা প্রতি জনেই এই রূপ নানাবিধ শুভাশুভ অবস্থার মধ্যে নিয়তই স্থিতি করিতেছি ; ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপন শুভ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সতেজ রাখা,—যেন বাহিরের কোন অশুভ ঘট-

নার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাও আবার আমাদের মঙ্গলের প্রতিকূল হইয়া না দাঁড়াই। আকাশস্থিত চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন ভূমিতে পদ-চারণ করি, তখন বোধ হয় যেন চন্দ্র আমা-দের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে; সেই রূপ পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন কার্য্য করি, তখন মনে হয় যে সেই ঘটনা সকলের সঙ্গে আমরা আপনারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছি, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকি, তখন দেখিতে পাই যে আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি, বাহিরের ঘটনা সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে এক মাত্র পরমেশ্বরই কেবল সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনীয়; এতদ্-ভিন্ন আমাদের এই যে আত্মা ইহা ক্রমে

ক্রমে যত পরিপক্ক হয় ততই অধিকতর অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে; যেমন বালকের চঞ্চল মন বয়োধিক্য সহকারে ক্রমে ক্রমে স্থৈর্য্য লাভে সমর্থ হয়,—সেই রূপ। তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা যতদূর পারি ব্রহ্মেতে অবিচল রূপে সংস্থিত থাকিয়া—মনোমধ্যে কেবল মাঙ্গলিক বিষয় সকলই কল্পনা করি, এবং বাহিরের শুভাশুভ ঘটনা সকলকে সেই প্রকার কল্পনার স্রোতে সংগঠিত করিয়া লইতে সাধ্যমতে চেষ্টা করি; ইহাতে যদি আমাদের সে চেষ্টা বিফলও হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বচ্ছন্দতা অকুতোভয়তা কার্য্যদক্ষতা, এই প্রকার সকল অমূল্য স্থায়ী ফল প্রাপ্তি হইতে আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না; ঈশ্বরের অধীন হইয়া, বিচক্ষণতা সাহস ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্গুণ দ্বারা মনের প্রবৃত্তি সক-

লকে বশীভূত করিয়া আমরা যদি আমাদের কোন ন্যায্য অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন ফল আমরা অবশ্যই লাভ করিব, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে যে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন,—আপন প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া সেই অবস্থার উপযুক্ত রূপে সংসার কার্য্যে রত হওয়া, অগ্রে বর্ত্তমান অবস্থার উপযুক্ত হওয়া পশ্চাতে সাধ্যানুসারে ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করা, বিহিত স্বার্থ সাধনের ইহাই পদ্ধতি। আমি যদি বর্ত্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হই, তাহা হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করা কি আমার পক্ষে কখন শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশেরই মঙ্গল সাধন করিতে অযোগ্য হই, তাহা

হইলে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবার ভার গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে শোভা পায় ? আমি যদি স্বদেশকে ঘৃণা করি, স্বদেশের নিন্দাবাদ করিতে লজ্জা বোধ না করি, তাহা হইলে পৃথিবীকে ভালবাসা কি আমার পক্ষে শোভা পায় ? আমি যদি আপনার মনকে বশীভূত করিতে যত্ন না করি, তাহা হইলে উপদেশ অথবা বহির্দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যের উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হওয়া কি আমার পক্ষে ভাল দেখায় ? পূর্ব্ব অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া আত্মপর নির্ব্বিশেষ মঙ্গল সাধন করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ; কিন্তু সে মঙ্গল সাধনের বিহিত উপায় যে কি—তাহা অধুনা এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, আপনার মঙ্গল সাধন করিয়া পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, পরিবারের মঙ্গল

সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি। বর্ত্তমান স্থলে বিধানের এই যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব, যথা,—অগ্রে আপনার মঙ্গল সাধন করিবে পরে অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে ইত্যাদি,—ইহা সময়ের অগ্র পশ্চাৎ নহে ;—একই সময়ে যদি আমি আপনার মঙ্গল সাধন করিতে পারি, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য ; বীর পুরুষেরা যখন স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে সমরে আহূত হন, তখন তাঁহারা এই রূপ মনে করেন যে দেশের মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে, সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার পরিবারের মঙ্গল হইবে, পরিবারের মঙ্গল হইলে তাহাতেই

আত্মার মঙ্গল ;—এই রূপ আপনার পর্য্যন্ত মঙ্গল মনে কল্পনা করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য ; অগ্র পশ্চাৎ ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে ত্াহার (সময় সম্বন্ধে নহে কিন্তু আবশ্যকতা সম্বন্ধে) প্রথম উ-পায়—নিজের মঙ্গল সাধন করা, দ্বিতীয় উ-পায়—পরিবারের মঙ্গল সাধন করা, ইত্যা-দি। পুরাবৃত্তেও এই রূপ ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন মহাত্মা জগতের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করি-য়াছেন, তিনি প্রথমে আপনার মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্-বর্গের, পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত মহাত্মাগণের চরিতাবলি পাঠ কর—দেখিবে

যে, যাহারা নীচ পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, অথবা ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই সমধিক সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা যদি সত্যই আমারদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে স্বার্থিক মঙ্গল সাধন করা তাহার একটি আনুসঙ্গিক উপলক্ষ না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সার সংকলন করিয়া স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া বিহিত রূপে তাহার সাধন করিবে; অর্থাৎ,— আমার আপনার মঙ্গল, আমার পরিবারের মঙ্গল, আমার দেশের মঙ্গল, ইত্যাদি আ-

মার সম্পর্কীয় যে কোন মঙ্গল হউক না, সমুদায়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর নির্ব্বিশেষ অনন্ত মঙ্গলের অন্তর্গত, এই রূপ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া যেমন পরমার্থত আমাদের সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য ; সেই রূপ আবার গৃহস্থ হওয়া, সামাজিক হওয়া, স্বদেশানুরক্ত হওয়া, ধর্ম্মানুগত স্বার্থ সাধন উদ্দেশে এই সকল উপায় অবলম্বন করা, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক মঙ্গল এবং তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত হইল যে, আমাদের বিষয়াভিমুখীন প্রবৃত্তি সকল-

কে—এক কথায় এই যে—মনকে, আত্মার অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, মন সেই রূপ বিষয়কে চায়; এবং মনের এই বিষয়-কামনা কেবল বিষয়েতে পর্য বসিত হইয়া নিরর্থক না যায়, এই জন্য ইহা কর্ত্তব্য যে মনকে যথোচিত রূপে আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বিষয় কামনা সকলকে তাহারদের বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—ইহা কখনই আমারদের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কি রূপ বিষয়-কামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং কি রূপ বিষয়-কামনাই বা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে তাহার এই মাত্র উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, "যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা।"*

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং কল্যাণেতে নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই সম্যক্ বুঝিয়াছেন—প্রকৃতিই বা কি এবং বিকৃতিই বা কি।

ধর্ম্ম-জীবী আত্মা এবং অন্ন-জীবী শরীর—পরমেশ্বর আমাদিগকে উভয়ই দিয়াছেন। আত্মা সদসদ্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধীর-ভাবে কার্য্য করে, শরীর উপস্থিত অভাবের তাড়নায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করে; আত্মা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোজ্য সামগ্রী সকলের আয়োজন করে, কিন্তু ক্ষুধার উদ্দীপন সময়ে সে-সকল সামগ্রী যখন ভোজনার্থে পরিবেশিত হয়, তখন আমাদের শারীরিক প্রকৃতি ভাবনা চিন্তার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া সে-সকলের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষুন্নিবৃত্তি কার্য্যে রত হয়। কিন্তু মনুষ্যের উপর ক্ষুৎপিপাসাদি প্রবৃত্তি সকলের কদাপি এত বল হইতে পারে না—

যদি পারে এমন হয় তবে তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না—যে তাহার সদসদ্ বিবেচনা তৎকর্ত্তৃক একেবারে পরাভূত হইয়া যাইবে। অতএব আত্মাকে সদসদ্ বিবেচনাতে নিযুক্ত রাখিয়া তদনুসারে আমরা যদি আমাদের কৌন শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতিকে চরিতার্থ করিতে পারি তবে তাহা করা অবশ্যই আমাদের কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এইরূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতি যে—সেও প্রজ্ঞাবান্. প্রকৃতিরও এক প্রকার সদসদ্ বিবেচনা আছে; বৃক্ষ আপন আধার-ভূমিস্থ অসার বস্তু হইতে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া লয়, মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে মধু বিবিক্ত করিয়া লয়; পক্ষীরা শাবকদিগের বাসোপযুক্ত করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, এ সকল কার্য্য যদি প্রজ্ঞার না হইবে তবে

আর কাহার ? সাংখ্য দর্শনের মত এই যে, প্রকৃতির সন্নিধিবশতঃ আত্মা সুখ দুঃখে মুহ্যমান হয় এবং আত্মার সন্নিধি বশতঃ প্রকৃতি প্রাজ্ঞ জীবের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই রূপ প্রতীতি হইবে যে, প্রজ্ঞা কেবল পরমাত্মাতেই মূল সমেত অবস্থান করে, তথা হইতেই তাঁহার মহিমা অবতীর্ণ হইয়া—আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধির আশ্রয়-ভূমি রূপে এবং ভৌতিক জগতে প্রকৃতির আশ্রয়-ভূমি রূপে—দুয়েতে দুই রূপে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিরও ধন নহে, প্রকৃতিরও ধন নহে, উহা বুদ্ধি এবং প্রকৃতি উভয়ের মূলস্থিত ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের ধনেই আমরা ধনী, তাঁহারই ধনে প্রকৃতি ধনবতী।

আমাদের আত্মার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আত্মা করুক এবং আমারদের প্রকৃতির যাহা

কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃতি করুক, তাহা হইলেই আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ই সমবেত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মার কর্ত্তব্য এই যে, সে জ্ঞান ভাব এবং স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে, প্রকৃতির কর্ত্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করে; প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা অনুক্ষণই সাধন করিতেছে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; আমাদের আত্মা যেন আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি সেই রূপ যত্নশীল হয়, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। যে পথে চলিলে জ্ঞান ভাব এবং ধর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—আত্মা সেই ঈশ্বরের পথে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করুক, প্রকৃতির অন্ধকারময় পথে বিচরণ করিবার তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; প্রকৃতির পথে প্রকৃতিই বিচরণ

করুক। প্রকৃতির গুণে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস যথানিয়মে গমনাগমন করিতেছে; আমাদের আত্মারও এ রূপ ক্ষমতা আছে যে সে আপন ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করে; কিন্তু আত্মা যদি ঐরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রকৃতির কার্য্য-সকল স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মারও কোন লভ্য নাই, প্রকৃতিরও কোন লভ্য নাই; প্রত্যুত আত্মার সেই অনধিকার চর্চার ছিদ্র দিয়া— আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়েরই কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি অনিয়ম প্রবেশ করে। অতএব উপস্থিত প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা-কার্য্য প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উক্ত কার্য্য যথোচিত রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে; সে প্রাকৃতিক নিয়ম এই রূপ যে,

যাহাতে আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভা-বিক চরিতার্থতার পক্ষে কোন ব্যাঘাত না জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও সুযোগ হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রবৃত্তি স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক; এক কথায় এই যে, যখন যেকোন প্রবৃত্তি উদ্দী-পিত হয়, তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে অতিক্রম না করে, বরং তাহার পোষকতা-তেই নিযুক্ত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণা-লীর উদাহরণ;—ক্ষুধার সময় আমাদের প্রকৃতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় যাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফূ-র্ত্তির সঞ্চার হইতে পারে; এই উপস্থিত ক্ষুৎপ্রবৃত্তিটি প্রকৃতি-অনুসারে চরিতার্থ হইলে আর আর সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিন্তু যদি প্রকৃতির প্রতিকূলে অপরিমিত আহার করা যায় তাহা হইলে আমাদের

শরীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং উপস্থিত ভোগ-লালসা ভিন্ন অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের উপযুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই রূপ, প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিশ্রম করিলে সমুদায় শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে তাহার বিপরীত ফল হস্তগত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্যই এই যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা—অন ান্য প্রবৃত্তি সকলের বৈধ চরিতার্থতার পোষকতা করুক; ইহার অন্যথায় যদি কোন এক প্রবৃত্তি এরূপে চরিতার্থ হয় যে তাহাতে আর আর প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহার কোন সংশয় নাই।

পরমার্থ অথবা ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হইলে যেমন স্বার্থ তাহার এক আনুসঙ্গিক

উপলক্ষ হয়, সেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথবা সমুদায় প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হইলে, যে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সহজেই চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ ;—ক্ষুধার সময় ভোজ্য সামগ্রী চাই, কার্য্যের সময় কার্য্যালয়ে উপস্থিত হওয়া চাই, শয়নের সময় শয্যা প্রস্তুত থাকা চাই, এই রূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি যথাকালে চরিতার্থ হওয়া চাই, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহার পর যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা পুর্ব্ব হইতে আয়োজন করা—স্বার্থের কার্য্য ; এবং এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা উদ্দেশে পুর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি সকল স্বার্থ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, ক্ষুধা বা কর্ম্ম-পটুতা বা নিদ্রা—যখন যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক তাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা হইতেই স্ব স্ব চরিতার্থতা-পথের অনুবর্ত্তী হইতে পারে।

স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে, পরমার্থের অনুগত হইয়া স্বার্থ সাধন করা কর্ত্তব্য ; এক্ষণে প্রাকৃতিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বৈধ স্বার্থের অনুগত হইয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য ।

সপ্তম অধ্যায় ।

উপসংহার ।

আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ যে তাহা কতক দূর যায়, তাহার ওদিকে আর যায় না । ইহা কেবল নহে যে আমরা আমারদের জন্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং মৃত্যু-সময়ে অজ্ঞান হইব ; ফলতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পাই যে, অন্তরের বার্ত্তা আমরা অল্প-

যাহা কিছু জানিতেছি, তাহার একটুকু ওদিকে গেলে প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকার-রূপ প্রশান্ত আবরণ আমাদের আত্মার পক্ষে পুষ্টি-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই; নিস্তব্ধ নিশীথে মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাওয়া যে রূপ, সেই রূপ জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদ্যা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, বিকৃতির অবস্থা হইতে প্রকৃতিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে আক্ষেপ করে যে, শৈশব-সুলভ অকলঙ্ক সুখরত্ন গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক নিভৃত প্রদেশ আছে, যেখানে গেলে এখনিই আমরা নিরীহ নিরাশ্রয় অজ্ঞান শিশু হইয়া যাই; যেখান হইতে আমরা আবার নূতন রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পারি;

যেখান হইতে পুনর্জ্জাত হইয়া ফিরিয়া আইলে পূর্ব্ব জীবনের যে সকল মঙ্গল বৃত্তান্ত তাহাই আমাদের সম্বল হয়, যে সকল অমঙ্গল বৃত্তান্ত তাহা বস্তুতঃ যেমন অসৎ, কার্য্যতও তেমনি অসৎ রূপে পরিণত হয়। অতএব আমরা যে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতেছি ইহা জানিতে হইলে, আমাদের জন্ম কালের এবং মৃত্যুকালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কল্পনা করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই. আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনিই আমরা তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি। যেখানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের বুদ্ধির দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, যেখানে আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই খানেই পরমেশ্বরের পূর্ণ মুখ-চ্ছবি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বর আমাদের

আত্মার স্রষ্টা পাতা এবং পরিত্রাতা— এই সুসংবাদ প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্ত আত্মাতে অতীব সুমধুর নিস্বনে সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিলেই হয়। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে পরমেশ্বর আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর অজ্ঞতা অবগত হইতে পারিতেছি এবং তাঁহার প্রতি সোৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তিনি আপনার একটুকু আভাস দেখাইয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছেন; মনুষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, কেবল দিবা নিশি তাঁহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্টতর আর এক প্রদেশে উপনীত হইতেছে। পশু পক্ষীদিগকে এ ভাবনা ভাবিতে হয় না, সুতরাং এ আনন্দেরও সহিত পরিচিত হইতে হয়

না; কেবল মনুষ্যেরই এই অনন্য-পরি-হার্য্য ব্যাকুলতা, মনুষ্যেরই এই অনন্য-বিতরিত আনন্দ।

আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পাইয়াছি; জ্ঞান পাইয়া তদ্দ্বারা আমাদের অজ্ঞতা অবগত হইতেছি; এবং আপনার সেই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমে-শ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি; অন-ন্তর তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধির অতীত মূল-সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্জ্বল-তর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে, মূল-সত্য সকল দ্বারা আমাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতেছে, এবং সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালনা দ্বারা আমা-দের শ্রীসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থার উ-ন্নতি হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর যেমন আমাদের জ্ঞানের স্রষ্টা, সেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের পালনকর্ত্তা ও প্রবর্দ্ধয়িতা; কিন্তু পূর্ব্বে

আমাদের অনিচ্ছায় আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা চাই যত্ন চাই প্রার্থনা চাই, তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রসাদে প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধির মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবে; এই রূপ করিয়া আমরা অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ উচ্চ-তর জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায় আমরা প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়া থাকি; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে; এবং ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন, হস্ত পদ পরিচালনা, প্রকৃতি আমাদের হইয়া এই সকল কার্য্য অবিশ্রান্ত সম্পন্ন করিতে থাকে। ক্রমে আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান আবির্ভূত হয়; ক্রমে আমরা জানিতে থাকি যে, এই বস্তুটিতে

আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে মাতাই আমার সহায়। পূর্ব্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তন্য পান দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হইত, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাশান্তির কারণ কি তাহার আ-ভাস আমাদের জ্ঞানে অল্পে অল্পে প্রতি-ভাত হইতে থাকে; কারণ-ভাব বস্তু-ভাব জাতি-ভাব এই সকল ভাব ভিতর হইতে কার্য্য করিতে থাকে; সুতরাং এই সময়ে বিষয়-বিষয়ীর ভাব পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বে প্রকৃতি যাহা করিত তাহাই হইত; এক্ষণে আমরা আপনারা আমাদের সম্মুখস্থিত দ্রব্যাদি সকলের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করি; শৈশবাস্থায় প্রবৃত্তি চরি-তার্থ হইলেই যথেষ্ট হইত, বাল্যাবস্থায় তদ্ব্যতিরেকে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা আসিয়া আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে; এক্ষণে "এ বস্তু তোমার নহে এ বস্তু আমার"—এই রূপে

ক্রীড়া সামগ্রী বিশেষে আমরা আপনার স্বত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হই; ক্রমে ক্রমে আমাদের এইরূপ অভ্যাস হয় যে, উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহাতে স্ব স্ব প্রবৃত্তি সকল আমাদের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ হইতে পারে তদুপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে অধিকাংশ আমরা কেবল আপনারই উদ্দেশে কার্য্য করি; বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আমরা আপনারই মনের উন্নতি সাধন করি, ক্রীড়া এবং ব্যায়ামাদি দ্বারা আমরা আপনারই শরীরের উন্নতি সাধন করি, তদ্ব্যতীত পরিবারের ভরণ পোষণ, জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বাল্যকালে এসকল লইয়া আমাদিগকে ভাবগ্রস্ত হইতে হয় না; পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিবার, সমাজ, দেশ, এই সকল লইয়া নানা চিন্তায় নানা

কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতে হয়। এসময়ে আমাদের আপনাদের যে কতটুকু বল এবং কি যে দুর্বলতা তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং আপনার সেই অকিঞ্চনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব আমাদের জ্ঞাননেত্রে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপে মনুষ্যের জীবন প্রাকৃতিক মঙ্গল হইতে স্বার্থিক মঙ্গলে এবং স্বার্থিক মঙ্গল হইতে পারমার্থিক মঙ্গলে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকে। কিন্তু কি প্রাকৃতিক কি স্বার্থিক সমুদায় মঙ্গলই পারমার্থিক মঙ্গলের অন্তর্গত। শিশু যে প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হয়, বালক যে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়, যুবক যে আপন স্বার্থকে ক্রমশ অন্যের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর সুচারুরূপে সংগঠিত করে, এ সকলেরই সহিত

পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমরা মঙ্গলের পথে কতক দূর অগ্রসর হইলেই তাহা স্পষ্ট রূপে আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হয়। পারমার্থিক মঙ্গলের সূর্য্যালোকে উপস্থিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে সংসারের কঠোরতা-সকল বিস্মরণ পূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনাকে বিক্রীত করি; শরীর যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে কৌশলে অবসৃত হইয়া অপার গম্ভীর সর্ব্বতঃপ্রসারিত প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হই। কৌশল আর কিছুই নহে কেবল এই যে, বাহিরের সামগ্রী সকলকে আমরা যেমন বস্তু ও কারণ বলিয়া বিশ্বাস করি, সহজ জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক আপন আত্মাকে সেই রূপ বস্তু (প্রেম গুণের বস্তু) ও কারণ (মঙ্গল-কার্য্যের কারণ) বলিয়া বিশ্বাস করা, এবং পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম-বস্তু ও সৃষ্টি-

স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা স্বরূপ পরম-কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা ; অতঃপর যাহাতে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক আমাদের আত্মা নিয়মিত হয় এবং আত্মা কর্ত্তৃক আমাদের প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত হয়, সেই পথ অবলম্বন করা।

কর্ম্ম কাণ্ডের সারমর্ম্ম এই।—আমাদের আত্মার মধ্যে একটি স্বভাবসিদ্ধ মঙ্গল প্রার্থনা আছে ; "আমি আছি" ইহা যেমন—আত্মার একটি স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞান, "আমি হই" ইহা সেই রূপ আত্মার একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনা ; আত্মার এ প্রার্থনা—জড়দেহ-সমীপে নহে কিন্তু জ্ঞানময় পরমেশ্বর সমীপে ; কেন না জ্ঞানই জ্ঞানকে বুঝিতে পারে ও জ্ঞানের অভাব মোচন করিতে পারে, জড় বস্তু কদাপি তাহা পারে না। যিনি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান স্বরূপ তাঁহারই নিকট আমাদের ঐ স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনাটি

নিবেদিতব্য। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনা যে তিনি পূরণ করিবেন ইহা বলা বাহুল্য। আত্মার উন্নতির জন্য আমাদের অকৃত্রিম প্রার্থনা হইলেই, তিনি তাহার যথেষ্ট ফল বিধান করিবেন—তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, আমাদের প্রার্থনানুসারে তিনি আমাদের আত্মাতে সমধিকতর অস্তিত্ব প্রেরণ করিবেন - ধর্ম্মবল প্রেমাহৃত এবং জ্ঞান-জ্যোতি প্রেরণ করিবেন—যাহাতে আমরা স্ব স্ব ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইতে পারি। এই রূপে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভ করা আ-মাদের প্রথম কর্ত্তব্য, অনন্তর সেই প্রশান্ত উন্নত ভাবকে সংসার ক্ষেত্রে যথা-সাধ্য বি-স্তারিত করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য সাধনে যখন আমরা নি-যুক্ত হইব, তখন আমাদের যে অজ্ঞান প্রকৃতি তাহাও পরিবর্ত্তন-শীল প্রাকৃতিক

মঙ্গলের পথে বিচরণ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ পাইবে। প্রকৃতি প্রাকৃতিক মঙ্গল কার্য্যে দিবানিশি নিযুক্ত রহিয়াছে,—থাকুক; আমরাও আইস আপন আপন মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিতে তৎপর হই; তাহা হইলেই আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিব যে, ঈশ্বরের পারমার্থিক মঙ্গল সংকল্প আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগতেই অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে,—মঙ্গলই জগতের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

কর্ম্মকাণ্ড সমাপ্ত।